BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

অপরাধ দমনে ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

ভূমিকাঃ আমরা জানি, মানব জীবনে শান্তির পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে মানুষের অপরাধপ্রবণতা। শান্তি প্রত্যাশী মানুষ অপরাধ ও অপরাধীর দৌরাত্ম থেকে নিজেদের সমাজ জীবনকে রক্ষার জন্য বরাবরই চেষ্টা চালিয়ে আসছে। কিন্তু কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থে অপরাধীর পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহণ করেছে, আবার কেউবা অপরাধ দমনে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা বাদ দিয়ে অন্য পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী আইনই মানুষের জীবন থেকে অপরাধের মূলোৎপাটন করতে পারে। এখানে কতিপয় গুরুতর অপরাধের ব্যাপারে ইসলামী দণ্ডবিধির যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো।

হত্যাঃ কুরআনের বিধান অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মহাজ্ঞানী আল্লাহ বলেন, "হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" (সূরা বাকারাঃ১৭৯) যেকোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই সামান্য চিন্তা করলে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে যে, হত্যাকারীকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে অন্যরা সবাই সাবধান হয়ে যাবে, ফলে খুন-খারাবীর কথা আর কেউ কল্পনাও করবে না। একজন খুনীর বিরুদ্ধে সময়মত আইনগত পদক্ষেপ নিতে না পারলে পরবর্তীতে তার দ্বারা লক্ষ প্রাণের বিনাশ সাধিত হতে পারে, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। বর্তমান বিশ্বে এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে। কেউ যদি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোন নিরপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তারপরও সে নিজের বাঁচার অধিকার পুরোদমে ভোগ করবে কোন যুক্তিতে? ইসলামী রাষ্ট্রে কখনোই সামরিক আদালতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রহসনমূলক সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় না; বরং প্রকাশ্য জনসমক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার পরই সৎ, যোগ্য, ঈমানদার, চরিত্রবান ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। ইসলাম কখনোই আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থন এবং আপিলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। ইসলামী আদালতে আসামী অসৎ উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করেছে বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না। কোন নিরপরাধ মানুষকে খুনের মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করাটাও ইসলামী রাষ্ট্রে অকল্পনীয়। আইনের শাসন না থাকলে মানুষ আইন হাতে তুলে নিতে বাধ্য হবে, এমনকি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়রা খুনী ব্যক্তির নিরপরাধ আত্মীয়-স্বজনের উপর পাইকারী প্রতিশোধ নিতে পারে। জাহেলী যুগে এভাবেই বংশানুক্রমিক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সূত্রপাত হতো। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের শাসনের মাধ্যমে কেবলমাত্র খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার মাধ্যমে ব্যাপারটা মীমাংসা করে দেয়া হয়। বর্তমান পৌরবিজ্ঞান ও অপরাধবিজ্ঞানে চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত, জানের বদলে জান নেয়ার ব্যবস্থাকে 'প্রতিশোধমূলক শাস্তি' বলে গণ্য করা হয়। আর কারাদণ্ড ও আর্থিক দণ্ডকে বলা হয় প্রতিরোধমূলক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরু পাপে লঘু দণ্ড দিলে অপরাধকে খাটো করে দেয়া হয়, ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আর আর্থিক দণ্ড তো ধনীদের জন্য অপরাধের ট্যাক্স ও লাইসেন্সসরূপ। জরিমানা ও ঘুষের মধ্যে এখানে কোন পার্থক্য নেই। আদালতের মাধ্যমে অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিলে সেটাকে প্রতিশোধমূলক শাস্তি বলা যায় না। কেননা বিচারক তো আর ভিকটিমের আত্মীয় নন। ইসলাম তো আর একটা খুনের বদলে দশটা খুন চায় না, কেবল খুনী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়, তবুও কেন এত আপত্তি? আমরা পৌরবিজ্ঞানে আরো শিখেছি, "আধুনিককালে অপরাধকে আর অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয় না।" কথাটি সত্যই বটে। কারণ হাদীসে আছে, "মানুষ যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে এবং যদি তওবা না করে আরো পাপ করতে থাকে, তবে পরপর দাগ পড়তে পড়তে অন্তররণ দাগে পূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।" প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে একদিকে যেমন অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা দরকার, অপরদিকে প্রতিরোধ ও সংশোধনের ব্যবস্থায় দরকার। ইসলামে সকল পদ্ধতিরই সমন্বয় সাধিত হয়েছে। একমাত্র ইসলামেই মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও পরকালের ভয় জাগ্রত করার মাধ্যমে অপরাধীদের সংশোধনের বাস্তব কর্মসূচী রয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন ক্রমাগত পাপ করতে করতে নিষ্ঠুরতার এমন চরম সীমায় উপনীত হয় যে, অপর মানুষকে একেবারে হত্যাই করে বসে, তখন আর সংশোধনের নামে উদারতা দেখানোর অবকাশ থাকে না। আর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তো নিতে হয় অপরাধ হওয়ার আগে। খুন-খারাবী সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই নিতে হয়। প্রতিরোধ বা সংশোধন সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যখন হত্যার কথা কারো প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা বা চিন্তা ও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু যখন তা কর্মে পরিণত হয়, তখন অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেয়া ফরজ হয়ে যায়। মানুষ কারাদণ্ডের ভয়ে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে, এ কথা শুনতেও হাসি পায়। খুনী ব্যক্তির পক্ষে সমাজে ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে অপমানিত হওয়ার যে ভয়টুকু থাকে, জেলে যাওয়ার ভরসায় সে তার থেকেও বেঁচে যায়। বর্তমান বিশ্বে গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা করা কোন অপরাধ নয়। ৪র্থ সপ্তাহে ভ্রূণের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় এবং ৩য় মাসে সে নড়া-চড়া করে, পা দিয়ে লাথি দেয়, হাত দোলায়, মুখে ভাবভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, এমনকি বৃদ্ধাঙ্গুলও চুষতে দেখা যায়। অথচ গর্ভপাত হচ্ছে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বা বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে ২-৩ মাস বয়সী ভ্রূণকে বিচ্যুত করা। গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা করা শিশু হত্যার চেয়েও নির্মম। কেননা শিশুরা কান্নাকাটি বা আর্তচিৎকারের মাধ্যমে জীবন ভিক্ষা চাইতে পারে, কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণ তাও পারে না। বর্ণিত আছে, মারামারির মধ্যে নিক্ষিপ্ত এক মহিলার পাথরে অপর এক মহিলার পেটের বাচচার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে হত্যাকারী মহিলার অভিভাবক ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করতে গিয়ে বলে, "আমি কার জন্য ক্ষতিপূরণ দেব, যে খাদ্যও গ্রহণ করেনি।" এতে রাগান্বিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "সে তো গণকদের ভাই।" জীবন্ত মানুষ ও গর্ভস্থ ভ্রূণ সকল হত্যার ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার প্রায়শ্চিত্য হচ্ছে নির্দিষ্ট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ।

ধর্মদ্রোহিতাঃ আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন, অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মহান রবের অশেষ অনুগ্রহসমূহ ভোগ করার পরও যারা খোদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধেই বিষোদগার করে, তাদের কিছুতেই আল্লাহর দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আমরা মারাত্মক পাপী হওয়া সত্ত্বেও যেই রহমাতুল্লিল আলামীনের (সাঃ) দোয়ার উছিলায় বড় ধরনের আসমানী গযব থেকে বেঁচে আছি, সেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবমাননা করার মত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ আর কি হতে পারে? যারা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে কথা বলাকে নিজেদের বাক স্বাধীনতা বলে দাবী করেন, তারা কিন্তু নিজেদের বিরুদ্ধে কোন সাধারণ কথা শুনলেও মানহানি মামলা করেন। তারা যদি পারেন, তাহলে আমরা কেন আল্লাহর বান্দা ও রসূলের (সাঃ) উম্মত হিসেবে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে মানহানি মামলা করতে পারব না? ইসলামে কেবল ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে জন্মগ্রহণের কারণে কাউকে শাস্তির বিধান দেয়া হয়নি, বরং কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই জাগতিক শাস্তির বিধান রয়েছে, যারা একবার ইসলাম গ্রহণের পর অথবা মুসলিম

পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আবার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, অথবা ইসলাম ধর্মের উপর অশালীন ভাষায় আক্রমণ করে কিংবা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানপাপীরা ইসলাম গ্রহণ করে তা পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া যে, ইসলাম সত্য ধর্ম হলে তা গ্রহণ করে মানুষ কেন তা পরিত্যাগ করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে গিয়ে বলেন, "আহলে কিতাবদের মধ্যে একদল বলে থাকে মুসলমানদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর প্রভাতে ঈমান আন এবং সন্ধ্যাবেলা অস্বীকার কর। সম্ভবত তারাও (মুসলমানগণ) ফিরে যাবে।" সুপরিকল্পিতভাবে আল্লাহর দ্বীনের সর্বনাশ সাধনের তৎপরতা নিঃসন্দেহে এক জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ বলেন, "আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।" (সূরা বাকারা) প্রশ্ন হতে পারে, কাফেরদের মধ্যে কেউ তাদের ধর্ম ত্যাগ করলে তারা তাকে শাস্তি দেয়; আবার আমাদের মধ্যে কেউ আমাদের ধর্ম ত্যাগ করলে আমরাও তাকে শাস্তি দেই। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কি? এর জবাব হচ্ছে, যে কেউ ইসলাম ত্যাগ করে নিজেদের স্বার্থে ইসলামের বারোটা বাজানোর উদ্দেশ্যে। এ কারণে ন্যায়নীতির খাতিরেই তাদের শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হয়। অপরদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করে, তারা আল্লাহর দ্বীনকে সত্য জেনেই কবুল করে। তারা কোনপ্রকার জাগতিক স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কাফেররা নিজেদের স্বার্থেই 'ধর্মত্যাগীদের' শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। অনেকে ইসলাম প্রচার ও অন্যান্য ধর্মের প্রচার এবং ইসলাম গ্রহণ ও অন্যান্য ধর্ম গ্রহণকে সমান দৃষ্টিতে বিচার করেন। কিন্তু সত্য আর মিথ্যা কি সমান হতে পারে? আল্লাহর ধর্ম আর শয়তানের ধর্ম কি আদৌ সমান হওয়া সম্ভব? মানুষকে জান্নাতের দিকে আহবান করা আর জাহান্নামের দিকে ডাকা কি একই জিনিস? উদাহরণসরূপ, নৈতিকতার প্রচার আর অশ্লীলতার প্রচার কখনো এক হতে পারে না। মানুষকে জান্নাতের দিকে আহবান করা জীবন রক্ষার চেয়েও মহৎ কাজ এবং জাহান্নামের দিকে আহবান করা হত্যার চেয়েও সর্বনাশা ব্যাপার। কেননা আখেরাতের জীবনকে বরবাদ করা দুনিয়ার জীবনকে বরবাদ করার চেয়ে অশেষ গুণ বেশী ক্ষতিকর। ঈমানের মূল্য জীবনের চেয়েও বেশী। যারা মানুষকে ইসলামের দিকে নিতে চায়, তারা এটা করে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য। পক্ষান্তরে যারা মানুষকে কোন বাতিল ধর্মের দিকে নিতে চায়, তারা এটা করে মানুষের অকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মদ্রোহিতাই সকল অপরাধের মূল। কারণ, আল্লাহবিদ্বেষী স্বঘোষিত নাস্তিকরাই নিজেরা সর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকে এবং মানুষকেও সেসব পাপে লিপ্ত হবার উস্কানী দেয়। তাই এদের বিরুদ্ধে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আইনগতভাবে ব্যবস্থা নিতে না পারলে গোটা দেশ অপরাধের জোয়ারে ভেসে যাবে। ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা হচ্ছে, "যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীর বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের একমাত্র শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের বিপরীত দিকের হাত ও পা কেটে দিতে হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এটা তাদের পার্থিব অপমান। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা মায়েদা) আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বলতে বুঝায়--

(১) আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে জেনেশুনে মারাত্মক কটূক্তি করা

(২) আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগের জন্য মানুষকে চাপ প্রয়োগ করা

(৩) আল্লাহর এবাদত তথা নামায-রোযা ও কুরআন-হাদীস শিক্ষা থেকে মানুষকে বাধা দেয়া

(৪) আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া-- আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মানুষকে হারাম কাজ করতে বা হারাম জিনিস খেতে বাধ্য করা

মূলত যারা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু, তারা মানবতারও দুশমন এবং তারাই মানুষের মাঝে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, অপরাধের বিস্তার ঘটায়। তারাই আল্লাহর দ্বীন ও মানুষের শান্তি বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মানুষকে নানা ধরনের অপরাধকর্মে লিপ্ত করতে সচেষ্ট থাকে। কাজেই দেশ ও সমাজকে অপরাধমুক্ত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে এই আগাছাগুলোকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেয়া।

বলৎকারঃ বলৎকার বা ধর্ষণ হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক অপর কোন নারী বা পুরুষের উপর জোরপূর্বক যৌন অনাচার চালানো। ইসলামী আইনে সাধারণ ব্যভিচারের শাস্তিই হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। আর সেই ব্যভিচার যদি জোরপূর্বক করা হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে বহুগুণ অধিক গুরুতর অপরাধ। ধর্ষণকারী একই সাথে দুটি অপরাধ করে; সে নিজে ব্যভিচার করে এবং অপরকে জোরপূর্বক ব্যভিচার করতে বাধ্য করে। প্রথমটির কারণে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সে যেহেতু আল্লাহর বান্দার উপর আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ চাপিয়ে দিচ্ছে, সেহেতু সে কার্যত আল্লাহর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে এবং মানুষের জীবনের চেয়ে মূল্যবান সম্পদ সতীত্ব ধ্বংসের মাধ্যমে হত্যার চেয়ে অনেক গুণ বড় অপরাধ করছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়, তাদের একমাত্র শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের বিপরীত দিকের হাত ও পা কেটে দিতে হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এটা তাদের পার্থিব অপমান। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা মায়েদা) কাজেই ধর্ষণকারীকে পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত করতে করতে বধ্যভূমির দিকে হাঁটিয়ে নিতে হবে এবং তার হাত-পা কেটে শূলে চড়ানোর মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। আর কেউ যদি প্রকাশ্যভাবে পূর্ব ঘোষণা দিয়ে একশত ধর্ষণ সম্পন্ন করে এবং তারপর সেঞ্চুরী উৎসব করে, কিংবা একশত শিশুকে বলৎকারের পর এসিডে ডুবিয়ে হত্যা করার পর প্রকাশ্যে গর্ব করে, তাহলে তা আল্লাহ, রাসূল ও সমগ্র মানব জাতির প্রতি সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। এমন অপরাধের শাস্তি যে কি হবে তা বের করা মুশকিল। এ ধরনের অপরাধীকে পায়খানায় ডুবিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেও সম্মান করা হয়। হাদীসে যদিও প্রাণীকে আগুনে পোড়াতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু বলৎকারীদের শাস্তিদানের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। কেননা ধর্ষণ ও বলৎকার এমনই অপরাধ যে, কোন হিংস্র প্রাণীও এসবের ধারে-কাছে যায় না। কাজেই যারা ওসব অপকর্ম করে, তারা জীবজগতের আওতার বাইরে। এসব অত্যাচারকে পাশবিকতা বললে পশুত্বের অবমাননা হয়। এছাড়া কুরআনে যেহেতু জখমের বিনিময়ে সমান জখমের বিধান রয়েছে, তাই সেই হিসেবে কেউ কাউকে আগুনে পুড়িয়ে থাকলে তার কিসাসও হবে আগুনে পোড়ানো। আর সুপরিকল্পিতভাবে শত মানুষকে বলৎকার করা যে আগুনে পোড়ানোর চাইতেও অনেক বড় পাশবিকতা, তা বলাই বাহুল্য। অতএব, এ ধরনের অপরাধীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করাটাই ন্যায়বিচারের দাবি।

নারী ও শিশু পাচারঃ ইউনেস্কোর ভাষায়, "নারী ও শিশু পাচার এবং বেশ্যাবৃত্তি একটি আন্তর্জাতিক শিল্পে পরিণত হয়েছে।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়, তাদের একমাত্র শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের বিপরীত দিকের হাত ও পা কেটে দিতে হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এটা তাদের পার্থিব অপমান। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা মায়েদা) ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আতিয়ার মতানুযায়ী, প্রত্যেককে তার অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তি দেয়া হবে। একশ্রেণীর দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক চক্র শিশুদের ধরে নিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে। বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে সেক্স ট্যুরিজম বা যৌন পর্যটন শিল্পে নিষ্পাপ শিশুরা পর্যন্ত যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। এশিয়াতে শিশু পতিতার সংখ্যা নাকি দশ লক্ষ। একদিকে চীনে জনসংখ্যা কমানোর জন্য শিশুদের হত্যা করা হয়, অপরদিকে ইসরাইলে জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিদেশী শিশু পাচার করে আনা হয়। যারা এমন কোন কাজের উদ্দেশ্যে শিশু অপহরণ

করে যেখানে শিশুদের মৃত্যু বা অঙ্গহানি অবধারিত, সেক্ষেত্রে অপহরণ ও ক্রয়-বিক্রয়কারীদের শাস্তির বিধান পাওয়া যায় সূরা মায়েদার ৪৫ নং আয়াতে। সেখানে আল্লাহ বলেছেন, "আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কাননর বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময়ে সমান যখম।" অতএব, যারা উটের দৌড়ে জকি বানানোর জন্য শিশু পাচার করে, তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যারা অঙ্গ ব্যবসার জন্য করে, তাদের অঙ্গগুলো তুলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা করতে হবে। আর যারা পতিতা বানানোর উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু অপহরণ ও ক্রয়-বিক্রয় করে, তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত করার পর শূলে চড়াতে হবে। আর যারা কেবল মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ করে, তাদেরকে চুরি-ডাকাতির দায়ে হাত কেটে দিতে হবে এবং মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ও ভীতিপ্রদর্শনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

মাদক চোরাচালানঃ পূর্বের অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াতটিতে যারা পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়, তাদের শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য হচ্ছে অরাজকতার উপাদান। অতএব, পৃথিবীব্যাপী অরাজকতার উপাদান ছড়ানোর মানেই হচ্ছে অরাজকতা ছড়ানো। যে ব্যক্তি নিজের টাকা-পয়সা, আরাম-আয়েশ ও বিলাসবহুল জীবনযাপনের লোভে অন্ধ হয়ে জেনেশুনে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে এবং মৃত্যু ও ধ্বংস সাধন করে; একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য। এক ব্যক্তি যদি ১০০ জনের কাছে মদ বিক্রি করে এবং সেই ১০০ জনের প্রত্যেকে যদি মদ কেনার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ১০ জনকে খুন করে, তাহলে এই সহস্রাধিক মানুষের হত্যার জন্য সেই বিক্রেতাই দায়ী হবে। বিশেষত যারা অশান্তি সৃষ্টি তথা ইসলাম ও মুসলমানের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে এমন কাজ করে থাকে, তাদের মৃত্যুদণ্ড রদ হবার কোন অবকাশ নেই। আর যারা কেবল নিজের স্বার্থের জন্য করে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে চুরির শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তবে এ কাজ যেহেতু আর দশটি চুরির মত সাধারণ ব্যাপার নয়, তাই এক্ষেত্রে কেবল হাত কাটা যথেষ্ট হবে না, বরং এর পাশাপাশি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। অবশ্য অপর এক দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, হত্যা-- সে ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে হোক অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর মানুষকে মাদকাসক্ত বানানোর দ্বারা যেহেতু মানুষের জীবনকে ধ্বংস করা হয়, সেহেতু এই বিচারেও এর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত। মানুষের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে না হলেও কোন কাজ করার সময় যদি মানুষ জানতে পারে যে, এর দ্বারা মানুষের অনিষ্ট হওয়া অবধারিত, তাহলে সে ইচ্ছাকৃত অপরাধের দায়েই অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হবে।

ব্যভিচারঃ বিবাহ বহির্ভূত পন্থায় দুই নরনারীর পারস্পরিক দৈহিক মিলনকে ব্যভিচার বলে। এর শাস্তি সম্পর্কে ইসলামের বিধান হচ্ছে, "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর-করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা নূরঃ২) এটা হল অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি, আর বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হচ্ছে রজম অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা। তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনে বলা হয়েছে, "ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ, তদুপরি সে নিজের সাথে আরো শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনা সংঘটিত হয়; অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক।" অতএব, ব্যভিচার ইসলাম তথা মানবতার জন্য সর্বাধিক গুরুতর হুমকি। সাধারণভাবে মানব জাতি এবং বিশেষভাবে মুসলিম জাতিকে হেফাজত করার জন্য এর মূলোৎপাটন অত্যন্ত জরুরী। আমরা মুসলমানদের ইতিহাসে যত বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফেকির দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, তার অধিকাংশের পিছনেই রয়েছে ব্যভিচারীদের ভূমিকা। মীরজাফর, মীরন, ঘষেটি বেগম প্রত্যেকেই ছিল ব্যভিচারী। ঘষেটি বেগম নিজের পরকীয়া যৌন সঙ্গীকে হারানোর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই সিরাজুদ্দৌলাকে উৎখাতে উঠেপড়ে লাগে। আমরা জানি, দয়া-মায়া, লজ্জাশীলতা আর পবিত্রতা হচ্ছে ঈমানের তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ব্যভিচারই একমাত্র অস্ত্র, যা ঈমানের এই তিনটি শাখাকেই মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ করে দেয়। পবিত্র কুরআনে দয়াময়ের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, "এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহর হারামকৃত প্রাণকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।" (সূরা আল-ফুরক্বানঃ৬৮) এখানে আল্লাহ আপন বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে 'দয়াময়ের বান্দা' বলে অভিহিত করার তাৎপর্য এই যে, দয়াময়ের বান্দা হিসেবে তাদের চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই দয়া নামক গুণটির প্রতিফলন থাকবে। যারা ব্যভিচার করে, তাদের অন্তর থেকে দয়া নামক গুণটি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নিষ্ঠুরতা এসে সেই স্থান দখল করে নেয়। হত্যা তো সরাসরিভাবেই দয়ামায়ার পরিপন্থী কাজ, যা কেবল দয়ামায়া বিলুপ্তির পরেই সম্ভব হয়। কিন্তু ব্যভিচার প্রত্যক্ষভাবে দয়া-মায়া থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কিত না হলেও ব্যভিচারী ব্যক্তির অন্যান্য আচার-আচরণ দেখে তার দয়ামায়া না থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব, ব্যভিচারই যে দয়ামায়া বিলুপ্তির প্রধান কারণ, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ আয়াতে হত্যা ও ব্যভিচারের কথা একসাথে উল্লেখিত হওয়ায় আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই দুটি অপরাধ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সূরা আল মুমতাহিনার দ্বাদশ আয়াতে ঈমানদার নারীদের শপথ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, "(তারা) ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না।" এখানেও দেখা যাচ্ছে, ব্যভিচার ও সন্তান হত্যা পরস্পর একই সূত্রে গাঁথা। আমাদের বাংলা ভাষায় যে 'খুন-খারাবি' শব্দটি প্রচলিত আছে, সেখানেও খুন অর্থ হত্যা, আর খারাবি অর্থ ব্যভিচার। কোন নারী ব্যভিচার করে গর্ভবতী হলে তা গোপন করার মাত্র দুটি পথ থাকে-- নবজাত শিশুকে হত্যা করে ফেলা, অথবা অজাত শিশুটিকে নিজের স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়া। কাজেই এগুলো না করার ওয়াদা গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামে কার্যত ব্যভিচারের পথই বন্ধ করা হয়েছে। ব্যভিচারী নারীরা ব্যভিচার করার পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেয় যে, এর দ্বারা কোন সন্তান ভূমিষ্ট হলে হত্যা করে ফেলবে, আর হত্যা করতে না পারলে পিতৃ পরিচয় বদলে দেবে। কিন্তু ঈমানদার নারীরা এ উভয় চিন্তা থেকেই মুক্ত থাকায় ব্যভিচারের কথাকেও কল্পনায় স্থান দেবে না। বস্তুত কোন নারী-পুরুষের মাঝে ব্যভিচার আর দয়া-মায়া একত্রে স্থান পেতে পারে না। কারণ, ব্যভিচারের ফলে কোন নারীর সন্তান ভূমিষ্ট হলে সে নিজের পাপের আলামত মুছে ফেলার জন্য অজাত শিশুটিকে গুম করে ফেলতে বাধ্য হয়। কেবল অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রেই নয়, নিজের বৈধ সন্তানও যদি কুকর্মের দৃশ্য দেখে ফেলে, তাহলে তাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নিতে পারে এ ধরনের অপরাধীরা। হত্যার সুযোগ বা সাহস না পেলে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন ও কণ্ঠরোধের দ্বারা আপন অপকর্মকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায়। এরা কেবল ঘটে যাওয়া অপরাধ গোপন রাখার জন্যই হত্যা ও নির্যাতনের আশ্রয় নেয় না, বরং ভবিষ্যতে অপরাধের পথকে কণ্টকমুক্ত রাখার জন্যও এরূপ ব্যবস্থা করে থাকে। ব্যভিচারী পুরুষরাও নিজেদের পাপকর্মের স্বার্থে স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে থাকে। পাপ করতে গিয়ে সামান্য বাধার সম্মুখীন হলেই ব্যভিচারীদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এরা কেবল পাপ ঢাকার জন্যই শিশু নির্যাতন করে না, বরং পরিবার ও সমাজের লোকদের কাছে নিজের পাপের স্বাধীনতা আদায় করার জন্যও আপন শিশুকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করে। ঘুষখোরেরা যেমন সরাসরি ঘুষ চাইতে ভয় ও লজ্জা পাবার কারণে কৌশলে মানুষকে হয়রানি করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে মানুষ নিজে থেকেই ঘুষ প্রদানের প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয়, তেমনি ব্যভিচারীরাও নিষ্ঠুর আচরণ আর অশান্তি সৃষ্টিমূলক কার্যকলাপের

দ্বারা সকলকে অতিষ্ট করে তোলে, যাতে মানুষ তাদেরকে ব্যভিচারের স্বাধীনতা দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। প্রগতিবাদীরা হয়ত বলতে পারেন যে, ব্যভিচার গোপন রাখা বা ব্যভিচারের স্বাধীনতা আদায় করার জন্যই যখন যাবতীয় নিষ্ঠুরতা হয়, ব্যভিচারে বাধা দেয়াই যখন সংঘাতের কারণ, তখন ব্যভিচারের জন্য শাস্তির বিধান করার পরিবর্তে একে বৈধ করে দিলেই হলো। তখন আর উক্ত কাজটিকে গোপন রাখা বা কন্টকমুক্ত করার জন্য কাউকে কোন নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করতে হবে না। কিন্তু যে কাজ প্রকৃতিগতভাবেই লজ্জাজনক, সেই কাজকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া হলেও কেউ তা প্রকাশ করতে সাহস পাবে না, বরং গোপন রাখার জন্য সন্তান হত্যা অব্যাহত রাখবে। আর যদি কেউ লজ্জা-শরমের মাথা সম্পূর্ণ খেয়ে বসে এ কাজকে প্রকাশ্যে করতে শুরুই করে, তাহলে তার হৃদয় এতই কঠিন হয়ে যাবে যে, তখন সে তার পাপ ঢাকা বা পাপের পথ খোলাসা করার প্রয়োজন ছাড়াই নিষ্পাপ শিশুদের উপর বর্বরতা চালাবে। ইউরোপ-আমেরিকায় তো ব্যভিচার আইনসিদ্ধ ব্যাপার, সেখানে তো কোন সামাজিক লজ্জা বা রাষ্টীয় বাধা-নিষেধের ব্যাপার নেই, তবু কেন সেখানে শিশুহত্যার হার আমাদের তুলনায় বহুগুণ বেশী? ব্যভিচারকে যদি বিনা বাধায় চলতে দেয়া হয়, তাহলে ব্যভিচারীদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত জৈবিক লালসা পূরণের পিছনে কোন পরিশ্রম করতে হবে না, ফলে তারা তাদের সমস্ত শক্তিকে মানুষের অনিষ্ট সাধনের কাজে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবে। এছাড়া অবাধ যৌনাচারকে কেউ আইন দিয়ে বৈধ করতে চাইলেও কোন স্বাভাবিক মানুষ নিজ জীবনসঙ্গীর পরকীয়া প্রেমকে সহজভাবে মেনে নিতে পারবে না, কারণ তা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবের পরিপন্থী। ইসলাম যেখানে নিরপরাধ নারীদের কাছেই আপন সতীত্ব ও সন্তানের জীবন রক্ষার শপথ গ্রহণকে উৎসাহিত করেছে, সেখানে অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আপোষ করার অবকাশ ইসলামে থাকতেই পারে না। কেউ যদি আপন সন্তানকে সংশোধনের জন্য শাসন করে তাহলে সেখানে বাইরের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। এছাড়া কেউ যদি সাময়িক ভ্রান্তির কারণে সন্তানের উপর জুলুম করে, তাকেও আপন ভুল বোঝার জন্য সময় দেয়া উচিত। কিন্তু তাই বলে কেউ নিজের ব্যভিচারের স্বার্থে আপন সন্তানের সাথে চিরস্থায়ী শত্রুতা পোষণ করবে আর সন্তানের জীবনের উপর একের পর এক আঘাত করতেই থাকবে, এমনটি মেনে নেয়া ইসলামের বিধান নয়। ইসলাম তো বিবাহিত ব্যভিচারীকে বেঁচে থাকার অধিকারই দেয় না, কাজেই এমন অপরাধীকে সন্তানের উপর শাসন করা, নিষ্পেষণ চালানো এমনকি সন্তানকেও নিজের মত কুৎসিত চরিত্রে গড়ে তুলতে চাওয়ার অধিকার দেয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। "আমার দেহ আমি দেব যাকে খুশী তাকে দেব, আমার বাচ্চা আমি মারব যেভাবে খুশী সেভাবে মারব" ইত্যাদি কুৎসিত শ্লোগান বরদাশত করার অনুমতি ইসলামে নেই। মানুষ তার দেহ বা সন্তান কোনটিরই মালিক নয়। এগুলোর যিনি প্রকৃত মালিক, তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারেই এগুলোর ভোগ-ব্যবহার করতে হবে, নিজের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশীমত নয়। মানুষ তো নিজের জীবনকে হত্যা বা নিজের চরিত্রকে কলুষিত করারই অধিকার রাখে না, সেখানে নিজের সন্তান বলেই কাউকে হত্যা বা কলুষিত করার আদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই। ব্যভিচারী নারীরা হালালজাদা-হারামজাদা নির্বিশেষে যেকোন শিশু সন্তানের ক্ষেত্রে হয় জন্মের সাথে সাথে মেরে ফেলে, অথবা পেটে থাকতে গর্ভপাত করে। অনেক সময় গর্ভপাতের সুযোগ না পেলে নিজের শরীরের উপর জুলুমের জোরে ব্যামো ঘটিয়ে পেটের বাচ্চাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালায়। যেসব শিশু সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়, তারাও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন ও বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। প্রশ্ন হতে পারে, ব্যভিচারঘটিত কারণ ছাড়াও তো সমাজে নিষ্ঠুরতা ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। কাজেই এসবের জন্য ব্যভিচারকে দায়ী করা কি কাকতালীয় ব্যাপার নয়? এর জবাব হলো, এসব ঘটনার সাথে সরাসরি ব্যভিচারের যোগসূত্র না থাকলেও বেহায়াপনা, বেপর্দা, বেগানা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদির যোগসূত্র অবশ্যই থাকে। এছাড়া অন্যান্য পার্থিব স্বার্থ, হিংসা-অহঙ্কার, শত্রুতা-বিদ্বেষ, যশখ্যাতির মোহ ইত্যাদি কারণেও মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ নির্মমতার পিছনে যে ব্যভিচারই প্রধান কারণ, এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ব্যভিচার দয়া-মায়াকে পরোক্ষভাবে ধ্বংস করলেও লজ্জাশীলতাকে ধ্বংস করে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে। এ কাজটা যে দৃশ্যতই লজ্জা-শরমের পরিপন্থী, তা স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত হলেও কুরআনের একটি আয়াত থেকে একথা আরো পরিস্কার হবে। আল্লাহ বলেন, "আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ৩২) ব্যভিচার স্বয়ং যেমন একটি নির্লজ্জ কাজ, তেমনি তা আরো অনেক নির্লজ্জতাকে বয়ে আনে। ব্যভিচারী ব্যক্তির কথা ও কাজে সর্বদা নির্লজ্জতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। এছাড়া অবাধ যৌনাচারে ক্রমাগতভাবে লিপ্ত থাকার কারণে কেউ কেউ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একঘেয়ে হয়ে পড়ে, ফলে সমকামিতার দিকে ধাবিত হয়। এমনকি নাবালকদের উপর পাশববৃত্তি চরিতার্থ করতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করে না। ঈমানের অপর একটি শাখা পবিত্রতাও মারাত্মকভাবে পদদলিত হয় এই ব্যভিচারের দ্বারা। কারণ, ব্যভিচারের ন্যায় নোংরা ও ঘৃণিত কাজ যে করতে পারে, তার মনে আর কোন ঘৃণার অনুভূতি বা পবিত্রতাবোধ থাকে না। নোংরামিই তার ধর্ম হয়ে দাড়ায়। ব্যভিচার কেবল ঈমানের বিশেষ বিশেষ শাখাগুলোকে গ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং বেপরোয়াভাবে এ অপরাধ করতে থাকলে এক পর্যায়ে তা গোটা ঈমানকেই বরবাদ করে দেয়। আল্লাহ-রাসূলের কথা, ইসলামের কথা তখন তামাশার বিষয়ে পরিণত হয় কিংবা গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যভিচার এমনই এক সর্বনাশা কাজ, যা মুসলমানের ঈমান আর মানুষের মনুষ্যত্বকে একেবারে নির্মূল করে দেয়। কুফরী, নির্লজ্জতা, নিষ্ঠুরতা, প্রভৃতি উপসর্গগুলো যে কেবল ব্যভিচারী ব্যক্তির নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সমাজদেহে সংক্রমিত হবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অসৎ লোকের সংসর্গ যদিও নিষিদ্ধ, কিন্তু একই সমাজে বসবাসরত মানুষের মাঝে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা মোটেই সহজ নয়। তাই যাবতীয় কুপ্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য এ ধরনের সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধীকে সময় থাকতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ অপরাধ মানুষের ঈমান ও মানবীয় গুণাবলী যেভাবে ধ্বংস করে, তেমনি জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্যও চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। একই নারীর শরীরে একসাথে একাধিক পুরুষের বীর্য সঞ্চিত হলে সেগুলোর সংমিশ্রণে বিষ উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে নানারূপ রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। হাদীসে আছে, "অসতী নারী বিয়ে করো না, সে তোমাকে যৌবনেই বৃদ্ধ বানিয়ে ছাড়বে।" ধূমপানের কারণে যেমন ধূমপায়ীর চেয়ে আশপাশের মানুষরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি ব্যভিচারের ফলে ব্যভিচারী ব্যক্তি অপেক্ষা তার জীবনসঙ্গীই অধিক ক্ষতির শিকার হয়। উদাহরণসরূপ, একটি বকরিকে একটু একটু করে বিষ খাওয়ানো হলে তা বকরিটির শরীরে সয়ে যায়, ফলে বিষের ফলে তার মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু সেই বকরির গোশত যখন কোন মানুষকে খাওয়ানো হয়, তখন তার শরীরে একবারে হঠাৎ করে বিষ ঢোকার কারণে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে। অনেক সময় দেখা যায় জলাতঙ্ক রোগবাহী কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত মানুষই কুকুরের আগে মরে। ঠিক তেমনি ব্যভিচারী নারী বিভিন্ন পুরুষের দেহ থেকে পর্যায়ক্রমে নিজের দেহে বীর্য সংগ্রহ করে নিজ শরীরকে একটা বিষের ডিপোতে পরিণত করে, তারপর সেই বিষ একবারে স্বামীর শরীরে ঢেলে দেয়। অতএব, কোন সমাজে যদি ব্যভিচার প্রসার লাভ করে, তাহলে সেখানে মানুষের বৈবাহিক সম্পর্কও নিরাপদ থাকে না। এসব কারণেই ব্যভিচার প্রবণতাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। কেউ হয়ত বলতে পারেন, ব্যভিচারের শারীরিক ক্ষতি ঠেকানোর জন্য তো কনডম ব্যবহার করলেই হল। এর জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো, রোগ প্রতিরোধ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। পাপ থেকে তওবা করার পর বিগত পাপের ফলে সৃষ্ট রোগব্যাধির চিকিৎসা অবশ্যই করা যায়। কিন্তু পাপকর্ম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে আযাব থেকে বাঁচতে চাওয়া আল্লাহর সাথে মোকাবেলা করারই নামান্তর। যারা আমাদের

কনডম ব্যবহারের উপদেশ দেয়, তারা আসলে এইডস থেকে বাঁচানোর জন্য এসব কথা বলে না, বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মন থেকে এইডস আতঙ্ক দূর করে নিশ্চিন্তভাবে আরো অধিক মাত্রায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করা।

সূরা নূরের যে আয়াতে ব্যভিচারীর শাস্তির কথা বর্ণিত আছে, সে আয়াতে সাথে সাথে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর এ নির্দেশ বাস্তবায়নের পথে কোনপ্রকার দয়া-মায়া যেন অন্তরায় না হয়। আল্লাহর নির্দেশের মোকাবেলায় কোনপ্রকার দয়া ও অনুকম্পাকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের ঈমানই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হচ্ছে তাঁর যাত, সিফাত ও তাওহীদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকলে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হবে। আর সিফাতে বিশ্বাস থাকলে আল্লাহর দয়া, ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার প্রতি আস্থা রাখতে হবে। এখন যদি অপরাধীকে দয়া দেখাতে গিয়ে আল্লাহর বিধান অমান্য করি, তাহলে যেমন আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করা হবে, তেমনি নিজেদেরকে আল্লাহর চাইতে অধিক দয়াশীল, ন্যায়বিচারক ও বুদ্ধিমান মনে করায় আল্লাহর সিফাতে নিজেদেরকে শরীক করা হবে। যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, তাদেরকে অন্যত্র কাফের, ফাসেক ও জালেম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহর বিধানকে অনুপযোগী মনে করা এবং সে তুলনায় নিজেদের সিদ্ধান্তকে অধিক উপযোগী মনে করা সুস্পষ্ট কুফরী। আর ফাসেক হবার কারণ হল, অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো অপরাধকে প্রশ্রয় দানেরই নামান্তর। তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনে বলা হয়েছে, "যার মধ্যে ফিস্‌ক তথা পাপাসক্তির বীজাণু বিদ্যমান আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে।" একমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধানই যেহেতু ন্যায়নীতি, সমতা ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সামান্য কমবেশী করতে গেলেই তা জুলুমে পরিণত হবে। অতএব, আল্লাহর বিধানকে যারা উপেক্ষা করবে, তারা জালেমরূপেই গণ্য হবে। আর আখেরাতে বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে আল্লাহর হুকুম লংঘনের দায়ে নিজেরা আখেরাতে শাস্তি ভোগের আশঙ্কা যেমন মনের মধ্যে জাগ্রত থাকবে, তেমনি অপরাধীদের সম্পর্কেও এ বিশ্বাস থাকবে যে, আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় খাতির করলেও আখেরাতে বাঁচাতে পারব না; বরং দুনিয়াতে শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ায় আখেরাতে তাদেরকে আরো অধিক খেসারত দিতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমানের দোহাই দিয়ে সতর্ক করেছেন যে, তারা যেন কোনপ্রকার দয়ার বশে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি থেকে ব্যভিচারীদের অব্যাহতি না দেয়। প্রশ্ন হতে পারে, ইসলাম তো দয়া ও ক্ষমাশীলতার ধর্ম। কিন্তু ব্যভিচারীদের ক্ষেত্রে দয়া ও অনুকম্পাকে প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করা হল কেন? আসলে ব্যাপারটা হল, ইসলাম মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার ক্ষেত্রে অবশ্যই সদাচরণ, সহনশীলতা ও উদারনীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর খলীফা হিসেবে মুসলমানদের যে দুটি দায়িত্ব রয়েছে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ, তার মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে সর্বদাই দয়া ও নম্রতা অবলম্বন করতে হবে, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষের ছোটখাট ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে হবে বিনয়-নম্রতা ও স্নেহশীলতার মাধ্যমে, আর বড় বড় ফৌজদারী অপরাধের প্রতিকার করতে হবে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে। বিশেষত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং ইসলামী আইন-কানুন জারির কথা জনগণের মাঝে ঘোষিত হয়ে যাওয়ার পর কেউ যদি তা লংঘন করে ওই সমস্ত অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন তাকে ক্ষমা করার কোন সুযোগই থাকে না। ইসলাম মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নিপীড়ন ও দুর্ব্যবহারের মোকাবেলায় ক্ষমা ও সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শনকে অবশ্যই উৎসাহিত করেছে, এমনকি আপনজনের খুনীকে ক্ষমা করার এখতিয়ারও দিয়েছে, কিন্তু ব্যভিচারের ন্যায় মানবতাবিরোধী অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে এতটুকু ছাড় দেয়াকে অনুমোদন করেনি। এখন আমরা যদি নিজ নিজ ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষকে ক্ষমা না করি, এমনকি কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদের ক্ষতিসাধন করলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হই; কিন্তু অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিচারের বেলায় দয়ালু সাজি, তাহলে তা হবে আল্লাহর হুকুমের সম্পূর্ণ বিপরীত। মনে রাখতে হবে, ক্ষমা ও উদারতার বৃষ্টি দ্বারা কেবল মানুষের ক্রোধের আগুনকে নিভানো যায়, কিন্তু কামলালসার আবর্জনাকে ধুয়ে ফেলা যায় না, বরং তা আরো দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। কামপ্রবৃত্তি এমনই এক অন্ধ ও দুর্দমনীয় তাড়না, যা কোন ওয়াজ-নসীহত বা যুক্তিতর্ক মানতে রাজি নয়, কেবল তাৎক্ষণিক শাস্তির ভয় ছাড়া যা কোনক্রমেই দমিত হয় না। এক্ষেত্রে যেকোন ধরনের দয়া-অনুগ্রহ অপরাধীর সাহসই কেবল বৃদ্ধি করবে। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, এ ধরনের অপরাধীর ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন কখনো কল্যাণ বয়ে আনেনি। নবাব আলীবর্দি খানের নির্দেশে সিরাজুদ্দৌলা ঘষেটি বেগমের প্রেমিক হোসেন কুলী খানকে হত্যা করেছিলেন। তাঁরা যদি স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে একতরফাভাবে একজন অপরাধীকে শায়েস্তা না করে নিরপেক্ষভাবে আল্লাহর বিধান অনুসারে উভয়কে শাস্তি দিতেন, তাহলে বাংলার মুসলমানদের ঐতিহাসিক বিপর্যয় নাও হতে পারত। সাপকে যদি পিটিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সে আবার প্রতিশোধ নিতে পারে। তাই সাপকে একবার ধরলে একেবারে শেষ না করে ছাড়তে হয় না। বিবাহিত ব্যভিচারী হচ্ছে বিষাক্ত সাপের মত। কারণ, বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করলে শরীরে যেমন বিষ জমে, তেমনি মনও বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এসব বিষের আধারগুলোকে অক্ষত অবস্থায় রাখা মানব সমাজের জন্য বড়ই বিপজ্জনক। আল্লাহর বিধান লংঘন করাই যেখানে ঈমানের পরিপন্থী, সেখানে এর বিরোধিতা যে কত বড় মারাত্মক তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য যারা এর বিরোধিতা করে, তারা ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন। তারা দয়া-মায়া ও মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে ইসলামী দণ্ডবিধিকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে চিহ্নিত করে। ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যভিচারীদের শাস্তি দেয়ার যে বিরোধিতা করা হয়, তার পিছনে মূলতঃ তিনটি কারণ বর্তমান; যথাঃ-

(১) অন্ধ ইসলাম-বিদ্বেষঃ পশ্চিমারা অন্ধভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে এবং ঢালাওভাবে ইসলামের সবকিছুকেই সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। তারা ইসলামের মাঝে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায় এবং ইসলামকে কিভাবে অমানবিক ও নিষ্ঠুরতার ধর্ম বলে চিহ্নিত করা যায় সেই চেষ্টায় মেতে থাকে। কাজেই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ইসলামে যে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে এটাকে তারা ইসলামকে হেয় করার মওকা হিসেবে ব্যবহার করে। এমনকি তাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের অপকারিতা এবং তা নির্মূলের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে, তারাও নিছক সমালোচনার খাতিরে ইসলামী আইনকে কটাক্ষ করে।

(২) ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতিসাধনঃ ইসলামী আইনের বিরোধিতা যারা করে, তারা আসলে মানুষের প্রতি দরদের জন্য তা করে না। তারা বরং ইসলাম ও মুসলিম জাতির বারোটা বাজানোর নিয়তেই এমনটি করে থাকে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা নূরঃ১৯) অর্থাৎ, ইসলামের শত্রুরা স্বাভাবিকভাবেই কামনা করে যে, মুসলমানরা সবাই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাক। তাইতো তারা ১৯৯৪ সালে কায়রো সম্মেলনে সারা দুনিয়াবাসীর উপর অবাধ যৌনাচার চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়। জাব্বারীন নামক এক কাফের সম্প্রদায় মূসা (আঃ)-এর সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হবার সাহস না থাকায় বনী ইসরাইলের বালআম নামক জনৈক স্বপক্ষত্যাগী আলেমের পরামর্শে নিজেদের সুন্দরী নারীদেরকে সাজিয়ে বনী ইসরাইল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দিয়েছিল, যাতে মুসলমানরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং গযবে নিপতিত হয়। মিশর-ইসরাইল যুদ্ধেও ইহুদীরা একই কৌশলে মিশরকে পরাজিত করে। নমরূদের নির্দেশে যখন ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের

প্রচেষ্টা চলছিল, তখন তারা বারংবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে অবশেষে শয়তানের পরামর্শে একদল যুবক-যুবতী এনে প্রকাশ্য পাপে লিপ্ত করে দিল, যাতে রহমতের ফেরেশতারা চলে যেতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, নমরূদ ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্মকে ঠেকানোর জন্য স্বামী-স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ করেছিল। আজও নমরূদের উত্তরসূরীরা বৈবাহিক সম্পর্ককে নিরুৎসাহিত করে, আর ব্যভিচারকে করে উৎসাহিত। ইসলামের শত্রুরা পতিতাবৃত্তির বয়স নির্ধারণ করে ১২ বছর, অথচ বিবাহ ও ধর্মান্তরের বয়স নির্ধারণ করে ১৮ বছর। মানুষ যাতে বিবাহের মাধ্যমে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে না পারে, ইসলাম গ্রহণ করতে না পারে এবং পাপের পথে যেতে বাধ্য হয়, সেটাই তাদের উদ্দেশ্য।

(৩) নিজেদের পাপের স্বার্থঃ কিছু মানুষ আছে নিজেদের পাপকর্মের স্বার্থেই ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে। কারণ, তারা ভাল করেই জানে যে, ইসলামী আইন থাকলে তারাই শাস্তির সম্মুখীন হবে। তারা নিজেদের পাপের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কেবল ইসলামী আইনের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং সবাইকে নিজের মত কুকর্মে লিপ্ত করতে চায়। এদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান। এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়।" (সূরা নিসাঃ২৭) এখন আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে, কামনা-বাসনার অনুসারী কারা। মানুষের পাপ প্রথমে থাকে একটি কর্ম, তারপর তা অভ্যাসে পরিণত হয়। এরপরও পাপ করতে থাকলে এক পর্যায়ে তা তার স্বভাব হয়ে দাড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত পাপই তার অস্তিত্বে পরিণত হয়। যাদের পাপ কেবল কর্ম ও অভ্যাসে সীমাবদ্ধ থাকে, তারা কামনা-বাসনার গোলাম নয়। বরং কামনা-বাসনার অনুসারী হচ্ছে তারা, পাপই যাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে, স্বভাব ও অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। এককথায়, যারা নিজের লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা অর্জনের জন্য যেকোন ধরনের নিষ্ঠুরতম পন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত থাকে, তারাই এর অন্তর্ভুক্ত। তারা আমাদেরকে আল্লাহর পথ তথা পবিত্রতা ও শালীনতার জীবনধারা থেকে সরিয়ে দিয়ে তাদের মত শয়তানী পঙ্কিলতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারায় সম্পৃক্ত করে নিতে চায়।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, ইসলামের শত্রুরা মানুষের প্রতি দরদের কারণে ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে না, বরং মানুষের অমঙ্গল সাধনই তাদের ব্রত। তারা দয়া ও মানবতার দোহাই দিয়ে নিষ্ঠুরতা ও মানবতাবিরোধী কাজকেই টিকিয়ে রাখতে চায়। তারা আমাদেরকে ব্যভিচারীদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নসীহত করে, অথচ ব্যভিচারীরা তাদের পাশবিক লালসা পূরণের পথে কোন দয়ামায়াকে প্রশ্রয় দেয় না। কাজেই তাদের প্রতি একতরফা দয়া প্রদর্শন মানবতার ধ্বংসই ডেকে আনবে। জালেমের প্রতি দয়া করা মজলুমের প্রতি নির্দয় হবারই নামান্তর। ইসলামী আইনের সমালোচকরা এমন ভাব দেখায় যেন তারা আল্লাহর চেয়েও বড় দয়াশীল। অথচ আসলে তারা শয়তানের চেয়েও বড় নির্দয়। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ যদি বেশী হতে না পারে, তাহলে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দরদ বেশী হয় কিভাবে? অবুঝ শিশুর যেখানে সেখানে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করা যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়, তাহলে বুঝমান যুবক-যুবতীর যেখানে সেখানে যৌনকর্ম সম্পাদন করা কিভাবে ক্ষমার যোগ্য হতে পারে? এরা একতরফাভাবে অপরাধীকে শাস্তিদানের সমালোচনা করে, অথচ ব্যভিচারীদের হাতে যে প্রতিদিন অসংখ্য শিশু নিহত ও নির্যাতিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে তারা নীরব। যারা মানবাধিকারের নামে ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে, তারা আসলে শিশুদেরকে মানুষ মনে করে না। প্রশ্ন হতে পারে, অপরাধীর প্রতি দয়া না হয় বিসর্জন দিলাম, কিন্তু নিরপরাধ শিশুরা যে এতিম হয়ে পড়বে। এর জবাব হল, এদেরকে জীবিত রাখা হলেই বা শিশুদের কি এমন কল্যাণে আসবে? এরা লালন-পালন বলতে অখাদ্য-কুখাদ্য গেলানো আর কথায় কথায় আছড়ানো-পাছড়ানো ছাড়া আর কিই বা উপহার দিতে পারবে? একজন ব্যভিচারীর অধীনে শিশুকে যে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়, তার চেয়ে এতিম অবস্থায় জীবনযাপন শতগুণে শ্রেয়। কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তির অভিভাবকত্বে থেকে একটি শিশুর পক্ষে ঈমানদার ও চরিত্রবান হিসেবে বেড়ে ওঠা যে কতটা কষ্টসাধ্য, তা না বললেও চলে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল কি উত্তম নয়? কিসাসের মধ্যে যেমন আমাদের জীবন নিহিত আছে, তেমনি রজমের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের জীবন আর সতীত্ব।

ইসলামী আইন স্বয়ং অপরাধীর জন্যও কল্যাণকর। আমরা জানি, পাপের অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অথচ আত্মহত্যা কোন প্রায়শ্চিত্য নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র পাপ। কিন্তু আদালতে এসে শাস্তি গ্রহণ করলে তা পাপ মোচনে সহায়ক হয়। দৈহিক কষ্ট মানসিক যন্ত্রণাকে হালকা করে দেয়। এছাড়া অপরাধীর চরিত্র সংশোধনেও ইসলামী দণ্ডবিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের কামলালসার উৎপত্তি হয় মস্তিষ্কে এবং তা মেরুদণ্ড হয়ে জননেন্দ্রিয়ে পৌঁছায়। কাজেই পিঠে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে এই সংযোগ পথকে বাধাগ্রস্ত করার দ্বারা যৌন উত্তেজনা হ্রাস পায়, ফলে পাপের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়।

প্রশ্ন হতে পারে, ইসলামী দণ্ডবিধির সুযোগ নিয়ে কেউ হয়ত নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করার প্রয়াস চালাতে পারে। এমনকি লম্পট পুরুষেরা কুপ্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে উল্টো সতী নারীর নামেই কুকর্মের অপবাদ দিয়ে বসতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যেকোন আইনেরই তো অপব্যবহার হতে পারে, তাই বলে তো পৃথিবী থেকে আইন-কানুন সব উঠিয়ে দেয়া যায় না। ইসলামী আইনের সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিধান রয়েছে। ইসলামী আইনের কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও কঠিন রাখা হয়েছে। "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।" (সূরা নূরঃ৪) তবে শর্ত হল, নারীকে ঈমানদার ও সতী-সাধ্বী হতে হবে। যার নিষ্ঠুরতার কথা সর্বজনবিদিত, যার খোদাদ্রোহিতা ও অশ্লীলতা ওপেন সিক্রেট, তার বিরুদ্ধে কেউ ব্যভিচারের অভিযোগ করলেও সেক্ষেত্রে অপবাদের হদ প্রযোজ্য হবে না। তবে অভিযোগকারীর উদ্দেশ্য যদি অসৎ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই অপবাদের দায়ে দণ্ডিত হতে হবে। একজনের অপরাধের সুযোগ নিয়ে অপরাধীকে ব্লাকমেইল করার মাধ্যমে অন্য কেউ যাতে অপরাধপ্রবণতা চরিতার্থ করতে না পারে, সেজন্যই এ ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন সহজ-সরল ও শান্তিপ্রিয় অমুসলিম নারীকেও যদি অপবাদ দেয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও অপবাদের হদ কার্যকর হবে। যারা সত্যিকার সতী নারী, ইসলামী আইন তাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তাদের ইজ্জতেরই রক্ষাকবচ হবে।

লক্ষণীয় যে, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারী নারীর কথা ব্যভিচারী পুরুষের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হল, ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সাধারণত নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীই সুপরিকল্পিতভাবে দাওয়াত দিয়ে সেজেগুজে পুরুষকে অপকর্মের দিকে আহবান জানায়; বেচারা পুরুষ সেই আহবানে সাড়া দেয় মাত্র। এছাড়া ব্যভিচারের অনুকূল পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট তৈরিতেও নারীরাই অধিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কর্ম সম্পাদনের পূর্বে সম্ভাব্য বাধা দূরীকরণে, গোল দেয়ার জন্য মাঠ ফাঁকা করে নেয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে তারা অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। শয়তানী কর্মের খাতিরে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারেও নারীদের দৃষ্টান্ত অনন্য। ব্যভিচারী নারী হয় নিজে ঘর ছাড়ে, অথবা কৌশলে স্বামীকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করে। ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়ে ধরা পড়ার ঝুঁকিও নারীকেই বহন করতে হয়। প্রশ্ন হতে পারে, ধর্ষণ তো একতরফাভাবে পুরুষরাই করে, সেখানে তো নারী নির্দোষ। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ধর্ষণের পিছনেও রয়েছে কিছুসংখ্যক নারীরই নেপথ্য ভূমিকা। ব্যভিচারী নারীরা একই বন্ধু নিয়ে পড়ে থাকে না, বরং তারা ঘন ঘন সঙ্গী পরিবর্তনে অভ্যস্ত। একজন ব্যভিচারী নারী যখন তার পুরাতন সঙ্গীকে ত্যাগ করে নতুন সঙ্গী গ্রহণ করে, তখন সেই পরিত্যক্ত সঙ্গী তার লালসা পূরণের বিকল্প উৎস খুঁজতে গিয়ে ভাল মেয়েদের উপরেই চড়াও হয়। এভাবে একশ্রেণীর ব্যভিচারী নারীই

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

নিজেদের মনের অজান্তে পুরুষদেরকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত করে তোলার মাধ্যমে ধর্ষণের পথে ঠেলে দেয়। বিশেষত যেসব ব্যভিচারী নারী ইসলামবিদ্বেষী, তারা জেনেশুনেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। তারা সঙ্গীদেরকে সঙ্গদানের জন্য মুসলিম নারীদের সতীত্ব হরণের শর্ত আরোপ করে। এসব কারণেই ঈমানদার ও সচ্চরিত্র নারীদের পক্ষে বেঈমান ও দুশ্চরিত্র নারীদের সাথে দেখা দেয়া সঙ্গত নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঈমানদার নারীদের প্রতি নিজেদের নারী ছাড়া অন্য কোন নারীর কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। (সূরা নূরের ৩১ আয়াত দ্রষ্টব্য) কারণ, বেঈমান ও দুশ্চরিত্র নারীরা ঈমানদার নারীদের সৌন্দর্যের কথা দুর্বৃত্তদের জানিয়ে দিয়ে এর মাধ্যমে তাদেরকে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাতে পারে। যারা নারী অধিকারের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে লেগে থাকে, তারাই নারী সতীত্ব লুণ্ঠনে মদদ যোগায়। তারা নগ্নভাবে চলাফেরা এবং সতীত্ব বিসর্জন দেয়াকে নারী অধিকার বলে গণ্য করে। অথচ মুসলিম নারীদের শালীনতা ও সতীত্ব রক্ষার স্বাধীনতা দিতে তারা রাজি নয়। নারী সতীত্ব রক্ষায় কোন পদক্ষেপ নিলে তারা সেটাকে পুরুষবাদী ও নারীবিদ্বেষী বলে প্রচার চালায়। অথচ জোরপূর্বক নারীর বস্ত্র ও সতীত্ব হরণ করা এদের কাছে কোন অপরাধ নয়। আমাদের দেশের জনৈক বিখ্যাত কবি পারস্পরিক সম্মতিভিত্তিক ব্যভিচারকে দোষনীয় মনে করেন না, কেবল জোরপূর্বক ধর্ষণকে অপরাধ বলে স্বীকার করেন। অথচ ব্যভিচার থেকেই যে ধর্ষণের জন্ম, একথা কোন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে না জানার কথা নয়। তিনি আসলে মনে মনে ধর্ষণকেও অপছন্দ করেন না, বরং ব্যভিচারকে জাস্টিফাই করার মাধ্যমে কার্যত ধর্ষণকেই জিইয়ে রাখতে চান। কিন্তু ধর্ষণের পক্ষে উকালতি করার সাহস না থাকায় কেবল ব্যভিচারের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন এবং নিজের মতলবকে ঢেকে রাখার জন্য ধর্ষণের সমালোচনা করেন। অতএব, তার মূল উদ্দেশ্য ধর্ষণের নিন্দা করা নয়, বরং ব্যভিচারের পক্ষে মতপ্রকাশ করা। ব্যভিচারে নারীরা যেমন অগ্রগামী, তেমনি তাদেরকে ব্যভিচার থেকে রক্ষার প্রয়োজনও বেশী। কারণ, আল্লাহ তাআলা সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের দায়িত্ব মূলত নারী জাতির হাতে ন্যস্ত করেছেন। এখন এই নারীরাই যদি কলুষিত হয়ে পড়ে, মাতৃস্নেহ হারিয়ে ফেলে, তাহলে গোটা মানব বংশের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হবে। যে নারীর কোল যুব সমাজের জন্য সংরক্ষিত, সেই কোলে যে কোন শিশুর স্থান হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। এসব কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করতে গিয়ে নারীদের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমাজ থেকে ব্যভিচার দূর করার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যভিচার নির্মূলে ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয়তা আশাকরি প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী আইনের বর্ণিত দণ্ডবিধি আসলেই ইসলামে আছে কিনা তা নিয়ে অনেক সময় বিতর্ক দেখা যায়। বেত্রাঘাতের বিধান সরাসরি কুরআনের আয়াতে থাকায় কোন মুসলিম এর বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখায় না। কিন্তু রজমের বিধান সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট আয়াত না থাকায় মুসলমানরাই অনেকে এটাকে ইসলাম-বহির্ভূত এবং মানব রচিত বেদআত ও বাড়াবাড়ি বলে গণ্য করে। এ ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে রজমের ব্যাপারে আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। ব্যভিচারের শাস্তি বেত্রাঘাত সংক্রান্ত সূরা নূরের আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ বেত্রাঘাত করতে হবে, আর বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। এছাড়া আল-কুরআনেও রজমের পক্ষে পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, খায়বরবাসী ইহুদীতের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের দুইজন বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচার করে ধরা পড়ার পর ইহুদীরা বলল, মদীনায় যেই লোক নতুন কিতাব নিয়ে এসেছে, তাতে রজমের বিধান নেই। সুতরাং কোন লোক পাঠিয়ে বিবাহিত ব্যভিচারীর দণ্ডবিধান জেনে নাও। যদি সে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেয়, তবে তা মেনে নেবে। আর রজমের কথা বললে মানবে না। সুতরাং তাদের কিছু লোক ঐ ব্যভিচারীদ্বয়সহ মদীনায় এসে স্থানীয় ইহুদীদের কাছে সব বর্ণনা করল। তখন তাদের একজন সম্ভ্রান্ত ইহুদী রাসূল (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তিবিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূল (সাঃ) তাদের কাছ থেকে রায় মানার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার পর জিব্রাঈল (আঃ) রজমের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন। ইহুদী লোকটি এই বিধান অস্বীকার করে বলল, তাওরাতে আল্লাহ ব্যভিচারের দণ্ডবিধান চল্লিশ বেত্রাঘাত এবং মুখে চুনকালি মেখে গাধার পৃষ্ঠে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাদাক ইবনে সুরিয়া নামক জনৈক ইহুদী আলেমকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। ইবনে সুরিয়া বলল, তাওরাতেও একই বিধান রয়েছে; কিন্তু আমাদের আলেমগণ বনী ইসরাইলের সম্ভ্রান্ত লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে রজমের পরিবর্তে বেত্রাঘাত ও মুখে চুনকালি দিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরানোর বিধান নির্ধারণ করেছে। সূরা মায়েদার ৪১ থেকে ৫০ আয়াতে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের। লক্ষণীয় যে, ইহুদীদ্বয় কেবল নিজেরা অপরাধ করেছিল এবং ইহুদীরা তাদের অপরাধীদের গ্রেফতার করেছিল এবং বেত্রাঘাত করতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কিতাবের বিধান অনুযায়ী রজম করতে অস্বীকার করতে গিয়ে আল্লাহর আয়াত গোপন করায় এটাকে আল্লাহ তাদের কাফের হবার কারণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ বর্তমানে মুসলিম সমাজে যারা কেবল নিজেরা পাপ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং গোটা সমাজের উপর নোংরামিকে চাপিয়ে দিতে চায়; তাদেরকে গ্রেফতার বা বেত্রাঘাত করা তো দূরের কথা, তাদের কারো বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ জানানোকেও বেয়াদবি বলে গণ্য করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, রজমের বিধান কেবল ইহুদীদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল, তাই তারা কিতাব অমান্য করার দায়ে অপরাধী হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও এ দণ্ড কেবল ইহুদীদের উপরই কার্যকর করেছিলেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সাঃ) তখন যে ফয়সালা দিয়েছিলেন তা কেবল তাওরাতের বিধান অনুসারেই ছিল না, বরং তাঁকেও সেই একই বিধান দেয়া হয়েছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ৪৯ নং আয়াতে, "আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।" এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল ইহুদী অপরাধীদেরই আলোচ্য দণ্ড দেননি, বরং মুসলমানদের মধ্যেও কেউ বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করেছে বলে প্রমাণিত হলে রজমের নির্দেশ দিতেন। এ ব্যাপারে রয়েছে একাধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। কিন্তু যারা পাথর মারার বিরোধী, তারা রজমের পক্ষের হাদীসগুলোকে জোরালো মনে করেন না। কিন্তু কথা হল ইহুদীদের তাওরাত বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে যে বিধানগুলো অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান ছিল সেগুলো মেনে চলা যেমন তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, তেমনি হাদীসের মধ্যে কিছু জাল হাদীস থাকা সত্ত্বেও সহীহ হাদীসের বিধানগুলো মান্য করা আমাদের জন্য জরুরী। ৫০ নং আয়াতে বলা হয়েছেন, "তারা কি জাহেলিয়াতের ফয়সালা কামনা করে?" অর্থাৎ, বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি বেত্রাঘাতে সীমাবদ্ধ রাখাটা ছিল জাহেলী যুগের নিয়ম, যা ইহুদীরা বানিয়ে নিয়েছিল। তদুপরি ৪৮ নং আয়াতেও বলা হয়েছে, "আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্য কিতাব, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।" একে আমরা তাওরাতে বর্ণিত রজম ও কিসাসের বিধান বহাল রাখার ঘোষণা হিসেবেই গণ্য করতে পারি।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানব জাতির মধ্যে ব্যভিচারই সবচাইতে মারাত্মক ও অমার্জনীয় অপরাধ। চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষের মাধ্যমে মানুষের টাকা অন্যায়ভাবে হাতিয়ে নিলে তা আবার ফেরত দেয়া যায়। কিন্তু ব্যভিচার একবার করে ফেললে আর তা বাতিল করা যায় না। ধর্মদ্রোহিতা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধী যদি ধরা পড়ার পূর্বে তওবা করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু কেউ ব্যভিচার করার পর যদি স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেয় ও আত্মসমর্পণ করে, অনুতপ্ত হয়, তবুও তার পার্থিব শাস্তি রদ করা যায় না। খুনী ব্যক্তিকেও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিতে পারে। কিন্তু ব্যভিচার এমনই এক অপরাধ, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না। মদ্যপায়ীকে বেত্রাঘাত করতে গিয়ে যদি মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। কিন্তু ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটলেও ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। হত্যা করলে কেবল নিহত ব্যক্তির দুনিয়া ও হত্যাকারী ব্যক্তির আখেরাত বরবাদ হয়। আর ব্যভিচার করলে একসাথে দুইজনের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হয়, হত্যার চেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ ক্ষতি হয়। হত্যার ফলে কোন পরিবার ভাঙ্গে না, একটি হত্যাকাণ্ডে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে ক্ষতি অতটা ব্যাপক হয় না, যতটা ক্ষতি হয়ে থাকে একটি ব্যভিচারের ফলে। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, "ফেতনা কতলের চেয়েও গুরুতর।" ব্যভিচার যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ফেতনা, তা বলাই বাহুল্য। তাই হত্যার ক্ষেত্রে কেবল সাধারণ মৃত্যুদণ্ড হলেও ব্যভিচারের ক্ষেত্রে পাথর মেরে তিলে তিলে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে।

মাসিক আল-ফুরক্বান, ডিসেম্বর, ২০০০--এপ্রিল, ২০০১